# নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে সামাজিক বাস্তবতার ভূমিকা

## লেখক পরিচিতি

**মোহা. মহসীন আলী**

গবেষক (পি.এইচ.ডি), বাংলা বিভাগ

বি.আর.এ বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, মুজাফফারপুর, ভারত

## সারসংক্ষেপ

চল্লিশের দশক বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির কাছে কালান্তরের কাল। অস্থিরতার কালও। স্বাধীনতা আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি বড়ো মাপের ব্যাপারগুলো আলোড়িত করেছিল লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। তিনি এই যুগ সংকটে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন বাংলা দেশে খাদ্যসংকট ও বস্ত্রসংকট জনিত ভয়াবহতায় একদিকে সমাজের দ্ররিদ্র শ্রেণীর মানুষের অসাহয় অবস্থা অন্যদিকে খাদ্য নিয়ে, বস্ত্র নিয়ে এক শ্রেণীর মুনফাবাজ, চোরাকারবারীদের রমরমা, খাদ্যে ভেজাল মেশানো, এমনকি গ্রামের দরিদ্র অসহায় নারীকে ছলে কৌশলে পণ্যে পরিণত করার মত দুঃখজনক ঘটনা। এককথায় এক অসুস্থ সমাজব্যবস্থা একজন সচেতন লেখক হিসেবে তাকে বিচলিত, ভাবিত করেছিল এবং সচেতন, দায়িত্ববান গল্পকার রূপে আপন কর্তব্য বিষয়ে প্রাণিত করেছিল। আর এই অসুস্থ সমাজজীবনের ছবি এঁকেছেন তিনি তাঁর বিভিন্ন ছোটোগল্পে। গল্পগুলি হল – ‘দুঃশাসন’, ‘ডিম’, ‘পুষ্করা’, ‘ভাঙা চশমা’, ‘বীতংস’, ‘কালোজল’, ‘উস্তাদ মেহারা খাঁ’, ‘হাড়’, ‘বস্ত্র’, ‘নীলা’, ‘নক্রচরিত’, ‘ডিনার’, ‘তীর্থযাত্রা’, ‘নেতার জন্ম’, ‘অধিকার’ ইত্যাদি। এই গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি তৎকালীন সমাজের অবক্ষয়, সর্বোপরি মনুষ্যত্বের বিনষ্টিকে পাঠকের সামনে প্রকট করে তুলে ধরেছেন। আমরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সামাজিক বাস্তবতার ভুমিকা কতখানি তা নিয়ে আলোচনায় প্রয়াসী হব।

## সূচক শব্দ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ছোটগল্প, সমাজ, বাস্তবতা, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

# নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সামাজিক বাস্তবতার ভূমিকা

**মোহা. মহসীন আলী**

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পের মেধাবী পুরুষ। তিনি চল্লিশের দশকের অন্যতম প্রধান গল্পকার। মন্বন্তর, দাঙ্গা, যুদ্ধ, গণবিক্ষোভ, রক্তাক্ত খন্ডিত স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু স্রোত-চল্লিশের বিপর্যয়কারী এই সব ঘটনা স্বাভাবিক কারণে প্রাধান্য পেয়েছে এই দশকের গল্পকারদের গল্পে। সেদিনের বিপর্যস্ত বাঙালী জীবনের এইসব নির্মম প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় এই সময়ের লেখকদের গল্পে। বলা যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম তো ননই, বরং এ সময়ের বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সময়ের এক প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পকার তিনি।

১৯৪১-৪২ এর দ্রুত পরিবর্তমান দিনগুলিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খুব কাছে থেকেই দেখেছিলেন যুদ্ধ-দাঙ্গা-মন্বন্তর-দেশভাগের বিপর্যয়। সেদিনের ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ তিনি স্বকর্নে শুনেছেন। মনুষ্যত্বহীনতার চরম পাশবিক রূপ দেখেছেন মানুষের মধ্যেই। শুনেছেন আর্ত চিৎকার - 'ফ্যান দাও'। দেখেছেন শহরের পথে সারে সারে মৃত মানুষের পচা গলা দেহ। 'নিজের চোখে না দেখলে জানতেও পারতাম না, সোনার বাংলার আসল চেহারাটা কী?' এরই মাঝে মানুষের কন্ঠে সংগ্রাম-শপথ-বাণীও শুনেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। চল্লিশের এই বিক্ষুব্ধ সময় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পী মনকে নাড়া দিয়েছিল। একজন সমাজ সচেতন লেখক হিসেবে সমকালের এইসব ঘটনায় স্বভাবতই তিনি বিচলিত হয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন। ঘৃণায়, ক্ষোভে, ক্রোধে, প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন তিনি।

তাঁর অধিকাংশ গল্পই সমাজ চেতনামূলক, যা তাঁর দায়বদ্ধ চেতনারই পরিচায়ক। যুগের হাওয়ার সঙ্গে সমতাল রক্ষা করেই তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। সেজন্য তাঁর জীবিতকালে সংঘটিত নানা আলোড়নের নিদর্শন আছে তাঁর নানা গল্পের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নির্বাচনে। চল্লিশের দশকের সর্বাপেক্ষা যে ঘটনা বাঙালি জীবন ও জীবনবোধকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল তা হল দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এবং মৃত্যুর সংখ্যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম জনশূণ্য শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার বুদ্ধিগ্রাহ্য পরিচয় আছে তাঁর- 'হাড়', 'দুঃশাসন', 'পুষ্করা', 'ডিম', 'নক্রচরিত', 'ভাঙা চশমা', 'তীর্থযাত্রা', 'কালোজল' প্রভৃতি গল্পে। এভাবেই সমাজবাস্তবতা বা কালচেতনা নানাভবে তাঁর গল্পগুলিতে ক্রিয়াশীল হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পের সমাজচেতনা নিয়েই আলোচনায় অগ্রসর হব।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পে প্রকট হয়ে উঠেছে মন্বন্তরকালীন বস্ত্রসংকটের তীব্রতাটুকু। এ গল্পে দেখা যায় একশ্রেণীর অসাধু বস্ত্র ব্যবসায়ীর গুদামে জমা থাকে কাপড়ের পাহাড়, কিন্তু আরেক শ্রেণী গ্রামের দরিদ্র মানুষ লজ্জা নিবারনের বস্ত্র পায় না। গল্পের শুরুতেই দেখি বস্ত্র ব্যবসায়ী দেবীদাসের কাছে 'তীর্থের কাকের মত' বসে একটি লোক । চাহিদা সামান্যই – এক জোড়া কাপড়। বিরক্তিতে শিরশির করে উঠল কাপড়ের মালিক দেবীদাসের শরীর। কিন্তু চতুর ব্যবসায়ী মুখের ভাষায় সেই বিরক্তিকে একটুও প্রতিফলিত হতে দিল না। সহানুভুতি ঝড়ে পড়া স্বরে জানাল – 'সবই ভগবানের মার। কেন যে এই যুদ্ধ বাধল আর আকাল দেখা দিল এক ভগবানই বলতে পারেন সে কথা।'[১] এরপরই আসে থানার এল.সি. কানাই দে। পঞ্চাশ টাকা চাঁদা নিতে এসেছে সে দারোগা শচীকান্তের পক্ষ থেকে। পঞ্চাশ টাকা দেবীদাস চমকে উঠলেও নির্বিকার কানাই। দারোগাবাবু শচীকান্ত বলে দিয়েছেন সারারাত্রি ব্যাপী যাত্রাপালার জন্য পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিতেই হবে দেবীদাসকে। ফলে অনিচ্ছাসত্বেও সেই টাকা দিতে বাধ্য হয় সে।

সন্ধ্যাবেলা ভাইপো গৌরদাসকে নিয়ে যাত্রার আসরে যায় দেবীদাস। 'দুঃশাসনের রক্তপান' পালার অভিনয় উপভোগ করে। সকালবেলা যাত্রা শেষ হওয়ার পর বাড়ি ফিরছিল দেবীদাস। ভাইপো গৌরদাসকে সঙ্গে নিয়ে ফেরবার পথে লক্ষ্মণ মুচির বাড়ির দিকে পা বাড়ালো সে। কিন্তু লক্ষ্মণের বাড়িতে গিয়ে যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল তারা, তাতে দেবীদাসের সমস্ত চেতনা যেন প্রচন্ড বিস্ময়ে নাড়া খেয়ে জেগে উঠল। ঘাটের পথে এক মুহূর্তের জন্য দেবীদাসের চোখে পড়ল একটি সম্পূর্ণ নগ্ন ষোড়শী মেয়ে - কোনখানে এক ফালি কাপড় নেই- কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরন করেছে তার।[২]

আলোচ্য গল্পের লেখক ইঙ্গিতে জানিয়েছেন, দেবীদাসের মতো দুঃশাসনেরাই এজন্যে দায়ী। যাত্রাপালার দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের জন্য শাস্তি পায়। তার বুকে বেঁধে ভীমের খর-নখর। কিন্তু এ যুগের দুঃশাসনরূপী দেবীদাসেরা কোনো শাস্তি পায় না। লেখক এই সমাজ অপরাধীদের নির্ভুলভাবে শনাক্ত করেন। এদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ও ব্যঙ্গটুকু প্রবলভাবে প্রকাশ পায়।

আলোচ্য গল্পের সমাপ্তি চমকপ্রদ। 'দুঃশাসনের রক্তপান' সত্যিই শেষ পর্যন্ত তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন কিনা, তা গল্পে অনুল্লেখিত, তবে ক্ষণিকের জন্য হলেও আত্মগ্লানিজনিত এক অদ্ভুত ভয় তাকে গ্রাস করেছিল, তা সুস্পষ্ট। নিপুণ মনস্তাত্বিকের মতোই দেবীদাসের মনের অবস্থা চিত্রণ করেছেন লেখক - 'রাত্রি জাগরণে দেবীদাসের মুখটা অদ্ভুত বিষন্ন আর পান্ডুর। ওদিকে ফসলহীন রিক্ত মাঠ। তারই ভাঙা আলোর ওপর দিয়ে একদল কাজ করতে চলেছে। তাদের ধারালো হেঁসোগুলাতে

সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠেছে। অকারণে অত্যন্ত অকারণে বড়ো বেশি ভয় করতে লাগল দেবীদাসের। অমন ঝকঝকে করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা?'[৩] দুর্ভিক্ষের প্রভাবে নিদারুণ খাদ্যাভাবের সাথে ভয়াবহ বস্ত্র সংকট মিলিত হয়ে বাংলাদেশের মানুষদের যে বড়ই অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তারই বাস্তব জীবন্ত কাহিনি বিবৃত করেছেন গল্পকার আলোচ্য গল্পে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইজ্জৎ' গল্পে সামাজিক সমস্যা হিসেবে এসেছে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরিবেশ। কিন্তু গল্পের প্রকৃত সমস্যা দাঙ্গা নয়, দুর্ভিক্ষের দিনে বস্ত্র সংকটের ভয়াবহতাই এই গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ফকিরের সমাধি আর ডাকাতে কালীর থানের সহাবস্থানে গ্রামে বহুকাল থেকেই হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল। কিন্তু মৌলবিসাহেব যেদিন গ্রামের মাদ্রাসায় এসে 'ওয়াজ' করলেন, সেদিন থেকেই মুসলমান পাড়ার ধুলা মন্তাই আর নমঃশুদ্র পাড়ার জগন্নাথ ঠাকুর দুজনের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ চরমে ওঠে এবং সংঘর্ষের মুখোমুখি হয় - 'আসন্ন ঝড়ের সংকেতে আকাশ থমথম করতে লাগল।'[৪] কিন্তু দুই নেতাই কাপড়ের অভাবে বাড়িতে বড়োই অসহায়। ধলামতাই ঘরের জরু বিটির ইজ্জৎ রক্ষা করতে পারে না, জগন্নাথ ঠাকুরের বউও কাপড়ের অভাবে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চেয়েছে। গ্রামের বড়লোক, ইউনিয়নর্বোডের মেম্বার ও ফুডকমিটির সভাপতি হাবিব মিঞার গুদামে কাপড় মজুত থাকলেও সে কাপড় ধলা মন্তাই এবং জগন্নাথ কেউই পেতে পারে না। অথচ হাবিব মিঞার লাল বিবির মৃত্যুর পর চমৎকার রঙিন শাড়ি আর ধবধবে কাপড়ে কাফন করা হয়। ধলা মন্তাই ও জগন্নাথ ঠাকুর দুজনে রাতের অন্ধকারে কবর খুঁড়ে সেই কাপড় সংগ্রহ করতে থাকে। বস্ত্র সংকটের এই চরম দিনে ফকিরের সমাধি আর ডাকাতে কালীর থান নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে তা এই ভাবে মিটে যায়। আলোচ্য গল্পে ধর্ম নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের রেষারেষি, অন্যদিকে বস্ত্রসংকটের তীব্রতাকে দেখানো হয়েছে।

তাঁর 'তীর্থযাত্রা' গল্পেও আছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার বীভৎস রূপ। চন্ডীমন্ডপে পুজো ছিল না, সাপ আর শেয়াল এসে বাসা বেঁধেছিল, বোধনতলায় ছড়িয়েছিল নরমুন্ড। 'বাংলার ঘরে ঘরে মঙ্গল প্রদীপের শিখা নিবে গেছে, ছায়াকুঞ্জর নিচে সোনার পল্লীতে কল্যানী গৃহবধুর কাঁকন আজ আর ছলভরে বেজে উঠছে না। ব্ল্যাক আউটের দিনেও নিবে যাওয়া তুলসীতলায় প্রদীপ সহস্র ছটায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে মহানগরীর গনিকা পল্লীতে।'[৫] এমন পরিস্থিতিতে গ্রামের তেরো থেকে ত্রিশ বছর বয়সের মেয়েদের কালীঘাটের মন্দির দর্শনের অজুহাতে অর্থ পিশাচ নরোত্তম ঠাকুর পাঁঠাবাহী নৌকায় করে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি তার চাতুরি। হয়তো বা গল্পকারের চাওয়াতেই মাঝি ফরিদের শুভবোধের উন্মেষে ব্যর্থ হয়ে গেছে তার পৈশাচিকতা এবং যোগ্য শাস্তিও পেয়েছে। অর্থপিশাচ

নরোত্তম যখন নৌকো থেকে নেমে সুখীকে ছেড়ে দেবার নাম করে গোলাম মহম্মদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিক্রি করে ফিরে আসে তখন এই ঘটনায় নৌকোর ধৈর্যহারা মাঝির (ফরিদের) লাঠির ঘায়ে নরোত্তম বালি আর কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। ফরিদের এই প্রতিবাদ আসলে নরোত্তমের উদ্দেশ্যে নয়। সেই সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে যারা নরোত্তমের মত ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়, ভন্ডামির মুখোশ পড়ে অসাহয় দরিদ্র মানুষজনদের ওপর অত্যাচার করে। আসলে শাসক শক্তিকে প্রতিহত করার বিপ্লবটাই তো করতে চেয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্পটির মাধ্যমে।

১৩৫০-এর ভয়াবগ দুর্ভিক্ষে একদিকে নিরন্ন, বুভুক্ষু মানুষদের শহরমুখীনতা, অন্যদিকে ধনীদের প্রীতিসুখকর জীবনযাপন চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর 'হাড়' গল্পে। আলোচ্য গল্পটি কলকাতা শহরের পটভূমিকায় রচিত। এই গল্পে সমাজের দুই বিপরীতধর্মী সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। একদিকে ধনী রায় বাহাদুর এইচ.এল. চ্যাটার্জির আবাসস্থল। বাগান, মালি, বিদেশী গ্র্যান্ডিফ্লোরার বাহারী চমকে সুশোভিত প্রাঙ্গন। অন্যদিকে মন্বন্তর পীড়িত মানুষের ছবি, বীভৎস আর্তনাদ - 'একটু দূরে মনোহর পুকুর পার্ক। আপাতত মনোহর নয় – কলোনী বসেছে সেখানে। নগরীর নির্মল স্ফটিক জলে জোয়ারের টানে ভেসে আসা একরাশ দুর্গন্ধ আবজর্না। চিৎকার করছে, কলহ করছে, পরস্পরের মাথা থেকে উকুন বাছছে, জানোয়ারের মতো ঝুঁকে পড়ে কালো জিভ দিয়ে খাচ্ছে হাইড্রেনের ময়লা জল।[৬]

আলোচ্য গল্পের সামাজিক চিত্র বড়ই নিমর্ম, করুণ। রায় বাহাদুর এইচ.এল. চ্যাটার্জির প্রাসাদ, গেটের কলার দর্শন কুকুর, বাগানে গ্র্যান্ডিফ্লোরার উগ্রমধুর সুরভি, অ্যাসফল্টের প্রশস্ত রাস্তা, মার্বেল পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, রঙিন কাচের জানালায় সিল্কের পর্দা, চীনে মাটির টবে কম্পমান অর্কিড আভিজাত্যগর্বিত সমাজ জীবনের প্রতীক। অন্যদিকে ডাস্টবিনে কুকুরে মানুষে খাদ্যসংগ্রহের প্রতিযোগিতা ও কাঠের মতো হাত-পা-ওয়ালা শিশুর হাড় চুষে খাওয়ার দৃশ্য বড়ই করুণ। অথচ আভিজাত্য-গর্বিত সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ রায় বাহাদুরের মতো মানুষের কাছে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের এই দুর্দশাগ্রস্থ জীবন ঘৃণ্য। তাই হাওয়াইয়ের হুলাহুলো ড্যান্স, স্টিভেনশন ব্যালেন্টাইনের প্রবাল দ্বীপের দেশ, ফিলিপাইনের যাদুবিদ্যা আর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে সংগ্রহ করে আনা রোডেশিয়ানের স্বজাতীয় অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক গড়িলার হাড় ও তাহিতির দ্বীপে বলি দেওয়া কুমারী মেয়েরে হাড়ের গল্প তাঁর মুখ থেকে শোনা গেলেও দুর্ভিক্ষের দিনে তা বড়ই বেমানান।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুষ্করা' গল্পটি একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে যে মহামারী একসময় গ্রাম বাংলায় চেপে বসে তারই এক বীভৎস রূপ এ গল্পে ধরা পড়ে। ড. বিনতা রায় চৌধুরীর কথায় বলা যায় - 'পঞ্চাশের মন্বন্তর অনিবার্য ভাবে নিয়ে আসে মহামারী।'[৭] মাত্র ক'টি কথাতেই

মহামারীর বীভৎস মূর্তিটি গল্পের শুরুর দিকে লেখক তুলে ধরেছেন দক্ষ চিত্রকরের মতন - 'আশেপাশে দশখানা গ্রাম জুড়ে মড়ক দেখা দিয়েছে, কলেরার মড়ক। আর সে কি মৃত্যু।'[৮] মহামারীর রোষ থেকে মুক্তি পাবার জন্য অর্থাৎ কুপিতাদেবীকে শান্ত করার জন্য তাই তিনশো টাকা কনট্রাক্টে তর্করত্নকে দিয়ে মহাজন বলাই ঘোষ শুক্লা চতুর্দশীর রাতে শ্মাশান কালীর পুজার আয়োজন করে শিবা ভোগ দিয়েছেন। কিন্তু শ্মাশান কালী নয়, ডোম পাড়ার বুবুক্ষ পাগলীটা সেই ভোগ এসে খেয়ে যায়। তালুকদার মহাজনের শোষনে পীড়িত বাংলার মড়ক আর মন্বন্তর সংস্কারাবদ্ধ দুর্বল মানুষকে এইভাবে সন্তুষ্ট রেখে এই শ্রেণীর মানুষগুলি সেদিনের মানবতার চরম অপমান করেছে। সমাজ সচেতন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুষ্করা' গল্পে সংস্কারাবদ্ধ মৃত্যুমুখী মানুষের অসাহয়তার সুযোগ নিয়ে তর্করত্নের এই সাজানো শিবাভোগের আয়োজন তাই সম্পূর্ণই হাস্যকর। আলোচ্য গল্পে একদিকে মানুষের অন্ধ সংস্কারের রূপ যেমন উপস্থাপিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি যুদ্ধের সময়ে মানুষের খাদ্যহীনতার চরম রূপ ধরা পড়েছে।

তাঁর 'আবাদ' গল্পটিতে দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। বরিশাল জেলার পটুয়াখালি মহকুমার চাষি পরাণ মন্ডলের ঘটনাবহুল জীবনের মধ্য দিয়ে এ গল্পের সামাজিক পরিবেশটি সুন্দরতার প্রকাশ পেয়েছে। আলোচ্য গল্পে লেখক দেখিয়েছেন, হিন্দু-মুসলমান যারা এতদিন পাশাপশি ভাই হয়ে বসবাস করত, তারাই দাঙ্গার সময়ে হয়ে উঠল পরস্পরের শত্রু । মুখুজ্জে বাড়ীর মেজকর্তা যিনি পরান মন্ডরের আশ্রয়দাতা, তিনি দেশ ছাড়লেন, কিন্তু নারান মন্ডল দেশ ছাড়ল না। সে বিশ্বাস করতো হিন্দুস্থান হোক আর পাকিস্থান হোক যে বন কেটে তারা বসত করেছে, সে জমি তাদের। টিকে ছিল পরান মন্ডলরা, কারণ দেশ হিন্দুর হোক আর মুসলমানের হোক, তাদের কোন অসুবিধে হয় নি। কারণ দাঙ্গা হিন্দু অথবা মুসলমান লাগাই নি । দাঙ্গার পেছনে যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কাজ করেছিল লেখক তাদের ভূত ও জিন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই ভূত আর জিনেরা মিলে ঘাড় মটকাতে লাগল মানুষের। লেখকের মতে তারা হিন্দুও না, মুসলমানও না।

তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'বন্দুক'। জোতদার, মহাজন সম্প্রদায়ের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য চাষিদের ভাগচাষ আন্দোলন ও জোতদার মহাজনের হৃদয়হীনতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। যুগ পাল্টে যাচ্ছে, দেশে স্বাধীনতা আসছে। তাই গরীব চাষিরা তাদের দুঃখ দূর করে অন্নের সংস্থানের জন্যে জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে যে ফসল তারা ফলায় সে ফসল কাটার অধিকার তাদেরই। এই সহজ সত্যটি তারা জোতদারদের বুঝিয়ে দিতে চায়। জোতদারকে তারা ফসলের এক ভাগ দিতে রাজি। জোতদার লোকনাথ সাহা, ফজল আলি, নুর মামুদ ও বৃন্দাবন পাল তাদের বুঝিয়েও নিরস্ত করতে পারেনি। তাই চাষীদের

নেতা রহমানকে রঘুরাম তাড়িওয়ালাকে দিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রঘুরাম কৌশলে তাদের চারজনের কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে এসে তুলে দিয়েছে রহমানেরই হাতে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ডিম' গল্পটি প্রকৃত অর্থেই যুদ্ধ সংক্রান্ত গল্প । মানিকের 'প্যানিক' গল্পের মতো এই গল্পে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ছাপ আছে। গ্রামে নদীর উপরে মিলিটারী ক্যাম্প। মিলিটারী সাহেবদের ডিম জোগান দেবার কন্ট্র্যাকটর প্যারীলাল কিভাবে হতদরিদ্র গ্রামবাসীদের পীড়ন করে সৈনিকদের জন্য শয়ে শয়ে ডিম আদায় করে তারই গল্প। প্রচন্ড খাদ্যাভাবে, অপুষ্টিতে, ম্যালিরিয়ায় ভুগে ভুগে হতদরিদ্র মানুষগুলো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেও তাদের হুকুম নেই একটা ডিম খাবার। একটা ডিম খেতে চায় রজনী নামে এক বৃদ্ধের নাতি। সে রুগ্ন শিশু কিন্তু রজনী দশআনা পয়সা কমিশন পাবে বলে সেই ডিম খেতে দিতে চায় না। দশআনা পয়সার বিনিময়ে তাদের পরিবারের একবেলা খাবার জুটবে। রুগ্ন শিশুটি তবু জেদ ধরায় রজনী তাকে গলা টিপে মারতে যায়, রাগের চোটে ছেলেটির গলা চেপে ধরায় তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে। পুত্রবধূ চেষ্টা করেও ছাড়াতে না পেরে শাবল তুলে শ্বশুরের মাথায় আঘাত করলে রজনী তৎক্ষণাৎ মারা যায়। সামান্য একটা ডিমের জন্য প্রাণ দিতে হয় এই জীর্ন শীর্ণ বৃদ্ধকে। যুদ্ধ কিভাবে এই হতদরিদ্র মানুষগুলোর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল তার নিখুঁত চিত্র এই 'ডিম' গল্পটি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার 'উস্তাদ মেহের খাঁ' গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস রূপটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। দাঙ্গার পটভুমি কোলকাতা শহর। 'ঝোড়ো মেঘের কালো রং ধরেছে দেশের আকাশে। কোলকাতায় কিছু দিন ধরেই সর্বনাশা দাঙ্গা শুরু হয়েছে হিন্দু মুসলমানের। প্রসাদপুরী কোলকাতা, আধুনিক কোলকাতা রূপান্তরিত হয়েছে সুন্দর বনে। তার পথে পথে এখন হিংস্র জানুয়ারের খুদিত পদ সঞ্চার।'[৯] দাঙ্গাকারীদের প্ররোচনা কিভাবে মানুষের সূক্ষ্ম বোধ-বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে তারই একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দীর্ঘ পনেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে আশ্রিত, বাবার আমলের বৃদ্ধ উস্তাদজী সম্বন্ধেও ছেলে শঙ্কররের ঘৃণ্য সন্ধিগ্ধ মনোভাব। তিনি উস্তাদজীকে গুনী নন, একজন নির্দিষ্ট জাতধর্মের মানুষ হিসেবে দেখলেন - 'উস্তাদজী গুনী নন, উস্তাদজী আর কিছু নন তিনি মুসলমান এবং ফলে তাঁকে বিশ্বাস করা চলে না।'[১০] দাঙ্গার লেলিহান শিখা শুধু মানুষ হত্যা করেই ক্ষান্ত থাকে নি, হত্যা করেছে মানুষের কোমল সুন্দর সূক্ষ্ম অনুভূতি ও মানবিকতাকে। যেখানে সংগীতশিল্পী বৃদ্ধ উস্তাদ মেহেরা খাঁও রেহাই পায়নি সেই কুটিল পৈশাচিক রোষবহ্নি থেকে। আশ্রয়দাতা শঙ্কর চৌধুরী পর্যন্ত অন্যায়ভাবে সন্দেহ করেছে এবং ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। শঙ্কর চৌধুরী বলে - 'দুধ দিয়ে বাবা কালসাপ পুষেছিলেন। আমার ঘরে বসে আপনি আমারই সর্বনাশ করতে চাইছেন।..... আমার বাড়িতে বেইমানের জায়গা নেই।'[১১] শঙ্কর উস্তাদজীকে বাড়ি ছেড়ে যেতে বলে। শঙ্কর চৌধুরীদের মতো একমাত্র

পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ শোনার পর 'ক্রোধে অপমানে উস্তাদজী থর থর করে কাপতে লাগলেনঃ তুমি - তুমি আমাকে এমন কথা বললে। শঙ্কর বললে, বললাম আপনি বিশ্বাসঘাতক আপনি বেইমান ! উস্তাদজী বসে পড়লেন। একটা কথা বললেন না, চাইলেন না একটা কৈফিয়ৎ।' [১২] মানুষের মানবতা, বিধ্বংসী সাম্প্রদায়িক পশুত্ব যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভুতির পরিপন্থী হতে পারে তার প্রমাণ মেলে গল্পের শেষে। আলোচ্য গল্পে হিংস্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-কবলিত কোলকাতার অন্ধ গলির মধ্যে হিংস্র জন্তুসম গুন্ডাদের হাতে মানবপ্রেমী, আজীবন সুরসাধক উস্তাদজীর মৃত্যুর বিষাদ রাগিনীই মুখ্য হয়ে উঠেছে। লেখক শ্রাবণের জলধারার বর্ষণমুখর জলস্রোতের মধ্যে দিয়ে উস্তাদজীর নির্মল পবিত্র জীবনস্রোতের রুধিরস্রোতের চিত্রটি খুব সুন্দরভাবে এঁকেছেন - 'বৃষ্টি পড়ছে দাঙ্গা কলঙ্কিত কোলকাতায় - নেমেছে শোকের মতো শ্রাবনের রাত্রি। তানপুরা কাঁধে পথে পথে ঘুরছেন উস্তাদজী। পা টলছে, চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। তিনদিন খাওয়া হয়নি। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, ক্লান্তিতে শরীর যেন লুটিয়ে পড়ছে তার। এ নরোত্তমপুর নয়, নবাবি আমলের বাগ-বাগিচা আমদরবাদের শহর দিল্লী নয়। এ কোলকাতা - আধুনিক উদ্ধত। এখানে উস্তাদজী কোথায় খুঁজে পাবেন তাঁর আশিক বাঈকে - কেমন করে তার হাতে তুলে দেবেন তাঁর শেষ অর্ঘ্য ?'[১৩] শেষ পর্যন্ত তাঁর নবতম শিষ্যার হাতে তিনি তার শেষ অর্ঘ্য তুলে দিতে পারলেন না। তার আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেলিহান শিখা তাঁকে গ্রাস করল। নির্জন পথে শ্রাবণের অশান্ত বৃষ্টি বৃদ্ধ উস্তাদজীর অশ্রুধারার মতো ঝড়ে পড়তে লাগল।

তাঁর 'ভাঙা চশমা' গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবসত্য সমাজ জীবনকেন্দ্রিকতা, মন্বন্তরের রক্তিম প্রেক্ষাপটে বসে স্কুলের মাষ্টারমশাই নিজের কথাই ব্যক্ত করেছেন উত্তম পুরুষের বাচনিক ভঙ্গিতে। গল্পের শুরুতেই কথকের ভাষ্যের মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কন্ট্রোল আর কালোবাজারের প্রসঙ্গ জানতে পারি। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধের ডামাডোলে মফঃস্বল শহরের ষাট টাকা মাইনের স্কুল মাস্টারি ছেড়ে গল্পের বক্তা হলেন সাব-ডেপুটি গ্রেডের হাকিম। গ্রামে গ্রামে দুর্গতদের মধ্যে সরকারি দাক্ষিণ্য বিতরণই তাঁর কর্ম। কথকের সাথে একদিন জনহীন পল্লির জীর্নগৃহে দেখা হয় দীন দুর্গত এক হেডমাস্টারের । বাহ্যিক চেহারায় যেন মৃত বাংলার প্রেতমূর্তির মতোই। সারাজীবন তিল তিল করে গায়ের রক্তে গড়ে তোলা তাঁর স্কুল, তাঁর জীবনের একমাত্র আশা যা দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে বিধ্বস্ত। তাঁর স্কুলে ছাত্র নেই, ছাত্ররা সবাই মন্বন্তর কবলিত। তবু পরম নিষ্ঠায় আঁকড়ে আছেন বিদ্যালয়কে। সরস্বতীর এই বরপুত্র তাই শূন্য শ্রেণিকক্ষেই তাঁর কল্পিত ছাত্রদের প্রিপোজিশেন পড়াতে থাকেন। কিন্তু তারই মধ্যে তিনি আঙুল তোলেন এই মন্বন্তর সৃষ্টিকর্তাদের দিকে - 'আমার সারাজীবনের সব কিছু স্বপ্ন এমন করে কে শেষ করে দিল বলতে পারেন ?'[১৪] হাকিম তাই চোরের মত ছাত্রশূণ্য ভঙ্গুর স্কুল থেকে পালিয়ে আসেন 'মনে হল

বিদ্যার এই তীর্থে আমার থাকবার অধিকার নেই - আমার ছোঁয়াতেও এখানকার সব কিছুর শুচিতা মলিন হয়ে যাবে। আমি ব্রতচ্যুত, লোভী, স্বার্থপর।'[১৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আলোচ্য গল্পে যুদ্ধজাত অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে ভেঙে পড়া সমাজ মনকে যেমন ব্যক্ত করেছেন, আদর্শ নীতির নির্বাপনের চিত্রটি যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি বিপরীতে এনেছেন আদর্শের স্থির দীপশিখাটিকে, সহস্র বঞ্চনার আঘাতেও যা নিষ্কম্প, অমলিন সৌন্দর্য নিয়ে চিরস্থির। তাই নায়কের ব্রতচ্যুতি, আত্মধিক্কার সত্ত্বেও গল্পের সর্বত্র ধ্বনিত হয় এক চিরন্তন আশ্বাসবানী, আস্তিক্যবোধ, যা কিছু মহৎ সুন্দর, তা অবিনাশী ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভোগবতী' (১৩৫২) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'ডিনার' গল্পটি তেরশ পঞ্চাশের পটভূমিতে লেখা। এই গল্পে গল্পকার দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে জঠর জ্বালা নিবৃত্তির জন্য মানুষ নিজের মেয়েকে দেহ ব্যবসায় নামাতে পারে তারই কাহিনী। গল্পের কেন্দ্রে আছে চম্পা নামক মেয়েটি। কথকের জবানিতে চম্পা সম্পর্কে ভাষ্য - 'ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করতে হত, ভাত না থাকলে ফ্যান খেয়ে মাঝে মাঝে পেট ভরাতে হত, রাতের পর রাত জেগে অসুস্থ পীড়িত বাপের পরিচর্যা করতে হত এবং ব্যাধি-জর্জর বিরক্ত বিতৃষ্ণ বাপের বীভৎসতম গালাগালিগুলো নীরব চোখের জলে তাকে সহ্য করে যেতে হত।'[১৬] এমনই মেয়ে চম্পা। পক্ষাঘাতগ্রস্থ রঘুপতির কন্যা। রঘুপতির ভাই রমাপতি দরিদ্র বাঙালী ঘরের এই মেয়েকে দেহ ব্যবসায় নামিয়ে আত্মহত্যা করাতে বাধ্য করে। গল্পের শেষ দিকেও মিলিটারীর বাহুবন্ধনে দেখা যায় তেমনি হয়তো এক অসহায় বাঙালী নারী। কথক রঞ্জন, পটল আর হরেনসহ রমাপতির ডিনার শেষে ফেরার পথে সে দৃশ্য তাদের মনোজগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বাহুবেষ্টিত নারীকে মনে হয় চম্পা।

তাঁর 'বীতংস' গল্পে ভূত-প্রেত, মন্ত্র-তন্ত্র-ঝাড়-ফুঁক শিকড় বাকড়ের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে অভ্যস্ত সাঁওতালদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের জীবনের এই সহজ চলায় ছন্দে সাধুবেশী সুন্দরলালের আবির্ভাব ছিল তাদের কাছে অভিশাপ। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুন্দরলাল সাঁওতাল গ্রামে আসে সন্ন্যাসীর ভেক ধরে। সে ধীরে ধীরে অত্যন্ত বুদ্ধিবলে সাঁওতালদের মনের ভেতরেও বিশ্বাসের ভূমি তৈরী করে ফেলে। অত্যন্ত সরল বিশ্বাসেই সাঁওতালরা তার প্রতারণার শিকার হয়। শিঙবোঙা, করমদেবতার প্রতিও ছিল তাদের অন্ধবিশ্বাস। কাজেই আসামের চা বাগানের জন্যে কুলি সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত সুন্দরলালের দৈববাণীকে তারা বিশ্বাস করে। এই কারণেই পাহাড় থেকে হরিণের পাল এসে গম খেয়ে গেলে তারা প্রতিকার খোঁজে সুন্দরলালের কাছে, বড়কা সাঁওতাল এক সাঁওতাল মেয়ের কপালে সিঁদুর লেপে দিয়েছে, কিন্তু সমাজের নিয়মে তার বিয়ে হয় না কেন- তিন মাস ধরে কারো পায়ের ঘা সারছে না - কেউ তার অনিষ্ট করেছে কিনা - এসব কিছুর জন্যে সুন্দরলালের কাছেই

তারা ছুটে আসত। সুন্দরলাল এই দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তার উপর শিঙবোঙার ভর হয়েছে ভাব দেখিয়ে সাঁওতালদের বিধান দেয়। করমদেবতার কোপ খেয়ে বাঁচতে হলে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। ঝড়ু সর্দারের মেয়ে বুধনীও সুন্দরলালের প্রলোভনের শিকার হয়েছিল। এই সুযোগে সুন্দরলাল উদ্দেশ্যসিদ্ধ করে সাঁওতালদের নিয়ে যায় আসামের চা বাগানের দিকে, সঙ্গে বুধনীকেও। আলোচ্য গল্পে সাঁওতালদের সহজ সরল জীবনে শঠ, প্রতারক সুন্দরলালের আর্বিভাব অভিশাপের মত কাজ করেছে। সাঁওতাল সমাজের সুখকর জীবনের ছন্দে যে দৈব বিশ্বাস ও সংস্কার ছিল বদ্ধমূল, সেইটিকে কাজে লাগিয়ে সাধুবেশী সুন্দরলাল তার কাজ হাসিল করেছে। গল্পের নামকরণও যথার্থ । 'বীতংস' শব্দের অর্থ ফাঁদ। সুন্দরলালের ফাঁদেই ধরা পড়েছে শেষমেষ সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষরা। সমাজ সমস্যামূলক গল্প হিসেবে এই গল্পটি তাই অত্যন্ত মূল্যবান।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বস্ত্র' গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভুমিকায় লেখা বস্ত্র সংকটের গল্প। গল্পকথক অন্ধকার রাতে দেখেছেন বস্ত্রের অভাবে নগ্ন ছাদেম ফকিরকে। ছাদেম শ্মশানে কাপড় খুঁজতে বেরিয়ে ছিল, যদি পায় একটুকরো ন্যাকড়ার ফালি বা চটের টুকরো বা বালিশের খোল। আর যদি বা একখানি নূতন কাপড় জোগাড় হল তাতে কার সম্ভ্রম আর আব্রু রক্ষিত হবে ? তার নিজের না স্ত্রীর, না পুত্রবধুর। তাই কাপড়খানি গলায় লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে ছাদেম। লাশকাটা ঘরে চালান দেবার সময় তাই কাপড় গলা থেকে খুলে দু'টুকরো করে কেটে নিয়ে শরীরের আংশিক ঢেকে কাঁদতে বসেছে তার স্ত্রী আর পুত্রবধু।

গল্পের উপসংহারে নির্মম এক দৃশ্যের সামনে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেন লেখক। সমাজ শত্রুদের নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দেন। ধিক্কার জানান। বিবেকবান শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দরজায় ঘা দেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পুরুষের পাশাপাশি অর্থোপার্জনের জন্য এগিয়ে এল নারী। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'মর্গ' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পের নায়ক মন্মথ। দু-দুবার আই.এ. পরীক্ষায় ফেল করার পর মন্মথ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হয়েছিল। মন্মথ বিয়ে করেছিল একটি ম্যাট্রিক পাশ মেয়েকে, যার নাম মমতা। কালক্যাবলা মন্মথ আই.এ. পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি, কিন্তু ঘরে তার ম্যাট্রিক পাশ বউ। মন্মথের এই আকাশস্পর্শী স্পর্ধা অবশ্য বেশি দিন থাকল না। ঢাকা মেলের ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মন্মথ চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যায়। পঙ্গু মন্মথ বীভৎসভাবে বেঁচে রইল পরিবার পরিজনের বোঝা হয়ে। মন্মথের স্ত্রী মমতা স্বামীকে বোঝা ভাবেনি। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে শহরের এক চালকলে জুটিয়ে নিল চাকরি। এ গল্প কিছু নৈরাশ্যের নয় - জীবননিষ্ঠার গল্প।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘নীলা’ গল্পে বাংলাদেশের সীতাগঞ্জ অঞ্চলের আঁখ চাষীদের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। সুগার মিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চাষীদের গুড় তৈরীর কারখানাই কেবল বন্ধ হয়ে যায়নি, গ্রাম থেকে যারা মিলে আঁখ নিয়ে আসত গাড়ির ওজন বাদ দিয়ে তাদের টাকা দেবার পরিবর্তে আঁখের অর্ধেক ওজন বাদ দিয়ে আঁখ চাষিদের ওপর বড়ই অবিচার করা হত। আঁখচাষিরা এজন্য আন্দোলন করলে কান্তি সান্যাল তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য ছাঁটাই হয়েছিল। পরে অবশ্য ম্যানেজার ভাস্কর নটরাজনের পার্সোনাল সেক্রেটারী নীলা কৌশলে কান্তি সান্যালকে কাজে বহাল করার অনুমতি ম্যানেজারের কাছ থেকে আদায় করে নেন। আলোচ্য গল্পে বাংলাদেশের সামাজিক জীবনযাত্রায় যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তারই পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। ট্যাগোরের রেড অলিন্ডার্স, লাভার্স গিফ্ট আর গীতাঞ্জলি পড়ে সুগার মিলের ম্যানেজার ভাস্কর নটরাজন কুন্তলার সাথে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়েছিল, অঞ্জনা নদীর ধারে খঞ্জনা গ্রামের প্রান্তে খুঁজে ফিরবে কোন এক রঞ্জনকে, সবুজ ধানের খেতে খুঁজে পাবে কৃষ্ণকলির কালো হরিণ চোখ। কিন্তু ভাস্কর সেদিন যে গ্রাম দেখেছে সে গ্রামে ছড়িয়েছিল দুঃসহ দারিদ্র্য। পচা, ডোবা, জঙ্গলে ঘেরা বাংলার গ্রামে হাড় বের করা বলদ, ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আর দুদর্শাগ্রস্থ মানুষের অসহায় জীবনযাত্রা বাংলার সমাজ জীবনের করন রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পে। তাই ‘নীলা’ সমাজ সমস্যা মূলক গল্প।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘শ্বেতকমল’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত ‘অধিকার’ গল্পটি উদ্বাস্তু সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। দেশভাগের সমস্যা নিয়ে লেখা আলোচ্য গল্পটি পাঠককে এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করায়। এই গল্পে দেখা যায়, ছেড়ে আসা কিছু ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু মানুষ আশ্রয় পেয়েছে উত্তর বাংলার প্রান্তরে। জলা-জঙ্গলে ভরা সেই জায়গাতেই তারা বসত তৈরী করে। সেখানে - ‘আগে বুনো শুয়োর দাঁতের আগায় খুঁজে ফিরত বুনো ওলের গোড়া। ঝাঁটার ঝমর ঝমর করে নূপুর বাজিয়ে সজারু চলে ফিরত ঘাসবনের বনে। বাবলা ঝোপের আড়ালে আড়ালে মেটে খরগোশের সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করত চিতা হরিণ। বাজ পোড়া তালগাছের কোটরে রোদ পড়ে চিকচিকিয়ে উঠত চন্দ্রবোড়ার হিলহিলে শরীর; আর জেলাবোর্ডের কালভার্টের তলা দিয়ে যেখানে বর্ষায় বিলের জল বেরিয়ে যায়, সেখানে ফণা তুলে বকের মতো বসে থাকত অতি বিষাক্ত জলগোখরো-গুগলি শামুকের প্রত্যাশায়..... মাইলের পর মাইল ছিল মরা মাটির রাজত্ব।’[১৭] সরকারি পুনর্বাসন পরিকল্পনায় হাজার দেড়েক মানুষকে ঠেলে দেওয়া হল সেখানে। দেওয়া হল কিছু চালাঘর - দুটি ট্রাক্টর আর একটি ট্রাক। এর বেশি কিছু নয়। তবু সেই জমিতেই বাম্পার ক্রপ ফলাল চাষীরা । কেউ তা রাখবার ব্যবস্থা করল না। ফলে পচে, রোদে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল সে সব ধান।

এই ব্যবস্থায় বাধ সাধতে চাইল জোতদারের দল। তারা চায় এই জমি তাদের কাছে ফিরে যাক আর এই অনিকেত মানুষগুলো একদল বিনিপয়সার মজুর হয়ে থাকুক। এইসব বুঝে হতাশ হয়ে পড়েন রিলিফ ওয়ার্কার হিমাংশু সোম। কিন্তু অবশেষে হিমাংশু সোমের হতাশার শেষ করে জাগল ওরা। তাদের হাতে লাঠি আছে, কাস্তে আছে। হাসুয়া নিয়েছে কেউ - 'ভয় নেই দাদা, আর এক দফা সোনার ফসলের সূচনা হতে চলল। ..... নবান্নের গন্ধে মাতাল হয়ে ওরা নেমে পড়েছে - পৃথিবীর কেউ ওদের ঠেকাতে পারবে না।'[১৮] আলোচ্য গল্পটির শিল্পরূপে এসেছে নৈরাশ্যকে ঝেড়ে ফেলে নতুন করে অস্তিত্ব রক্ষার জিদ।

তাঁর 'ভাঙাবন্দর' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'নক্রচরিত' গল্পটি মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত। আলোচ্য গল্পে পাঠক দেখতে পাই, মুনাফালোভী মজুতদার ও কালো বাজারীর হৃদয়হীনতার পরিচয়। গল্পের নায়ক নিশিকান্ত কর্মকার একধারে আড়াতদার, ব্যবসায়ী এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধের সুযোগে কালোবাজারিতে প্রচুর খাদ্য মজুত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টিতে সে সিদ্ধহস্ত। সাধারণের কাছে তার পরিচয় ধার্মিকরূপে, হরিভক্তিতে সে আত্মহারা, সে আসলে নিষ্ঠুর, নির্মম ও মনুষ্যঘাতক। নিশিকান্ত যেমন অর্থলোভী, তেমনি সে ধূর্ত। কোন সৎগুণ তার চরিত্রে নেই। বৈষ্ণব হয়েও নবযৌবনা বিশাখাকে যে সেবাদাসী করেছে। দুর্ভিক্ষের দিনে ইব্রাহিম দারোগাকে ঘুষ দিয়ে সে চাল মজুত করে, ডাকাতদের মালপত্র হজম করে। গল্পকার সমকালের লোভী মানুষের বিবেকশূন্যতা ও নীতিহীনতা নিশিকান্ত চরিত্রটি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করত চেয়েছেন।

গল্পের নামকরণও প্রতীকী। 'নক্র' শব্দের অর্থ কুমীর। অর্থাৎ কুমীর যেমন তার শিকার ধরার জন্য নিশ্চলভাবে পড়ে থাকে। তারপর সুযোগ বুঝে সচলতা প্রাপ্ত হয়ে সমগ্র শিকারকে সে ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করে। আলোচ্য গল্পেও দেখি মদন-যোগী প্রভৃতি ডাকাত, নবযৌবনা বিশাখা তথা গ্রামের সব সুন্দরী মেয়ে, ইব্রাহিম দারোগা, দুর্ভিক্ষের সময়কার অসংখ্য দরিদ্র নিরন্ন মানুষ কোন না কোন ভাবে নিশিকান্তের শিকারে পরিণত হয়েছে।

তারঁ 'নেতার জন্ম' গল্পে রোগপান্ডুর বাংলাদেশে এম.ভি., এফ.আর.সি.এস ডাক্তার বটব্যাল 'সার্ভ অ্যান্ড সেভ ইয়োর কান্ট্রি' এই আদর্শ নিয়ে কাজ শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত আদর্শবিচ্যুত হয়েছেন। তাই মেদিনীপুরের গ্রামের দরিদ্র-মুমুর্ষ বিধবার সন্তানকে ডেলিভারী করানোর চেষ্টা নিয়েও শেষ পর্যন্ত উৎকণ্ঠিত জনতার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য তিনি কৌশলে শিশুটিকে হত্যা করেন। অন্যদিকে টাকার লোভে বড়লোক রামদাস বাবুর স্ত্রীর ডেলিভারীর জন্য ছুটে যান। অথচ দরিদ্রমায়ের যে ছেলেটি পৃথিবীর মুখ দর্শনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল, বেঁচে থাকলে তার পাঁচ হাত লম্বা শরীর ও

লোহার মত প্রশস্ত বুক নিয়ে সেই হত ডিলেজ আন্দোলনের নেতা। পরিবর্তে রামদাসবাবুর চামচিকের মতো রুগ্ন ছেলে একদিন হবে বড়ো নেতা। লেখকের ভাষায় 'লক্ষ নর মুন্ডের সিংহাসনে নেতার অধিষ্ঠান'।[১৯] ডাক্তার বটব্যালের আদর্শ-প্রবণতা থেকে আদর্শ-বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে আলোচ্য এই গল্পে সামাজিক সত্যটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কালোজল' গল্পটিতে দুর্ভিক্ষের সর্বনাশা রূপ অঙ্কন করেছেন। গ্রামীণ পটভূমিকায় গল্পটি লেখা। আলোচ্য গল্পে লেখক দুর্ভিক্ষের জন্য যারা দায়ী তাদের পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র গল্পটি শীতল মাঝির দৃষ্টিতে পরিবেশিত হয়েছে। দীর্ঘদিন পরে তারাপদ নৌকাযোগে গৃহে প্রত্যাবর্তন করছে, শীতল মাঝিকে সে ঘরে ফেরার উৎকণ্ঠায় কেবল দ্রুততর হতে অনুরোধ করে। স্ত্রী, কন্যা, পরিজনদের সঙ্গে মিলনের অধীরতায় পথটুকু তার দীর্ঘ মনে হয়। কিন্তু অবশেষে বাড়ি ফিরে সে আবিষ্কার করে বাড়ির বিধ্বংসী রূপ। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত তারাপদর পরিবারটির বর্ননা পাই - 'তারাপদ ! একটা আর্ত প্রতিধ্বনি, পরক্ষণেই আবার নিঝুম মেরে গেল সমস্ত। .... একটা মাটির প্রদীপ হাতে বেরিয়ে এল বড় শালা অনন্তের স্ত্রী প্রতিমা। নিরাভরণ হাত, ছিন্ন শাড়ির অন্তরালে একটা কঙ্কালসার দেহ, প্রতিমা নয়, প্রেতিনী।... এতদিন পরে এলে ভাই! কেন এলে? - একটা বুকফাটা কান্নায় প্রতিমা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে.... পাথরের মুর্তির মতো দাঁড়িয়ে সব শুনে গেল তারাপদ। কলেরায় মারা গেছে জানকী চক্রবর্তী। ভুনি একদিন বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি, শোনা যায় কারা নাকি তাকে নিয়ে গিয়ে কোলকাতায় বিক্রি করে দিয়েছে। আর অরুনা পেটের ভাত আর পরনের কাপড় যার জোটে না, যার স্বামী থেকেও নেই, তার শেষ পথই খুঁজে নিয়েছে সে। ঘরে মাটির কলসি ছিল এবং খালে জলের অভাব ছিল না।'[২০]

আলোচ্য গল্পে লেখক শুধু তারাপদের পরিবার নয়, আরও বহু পরিবার ও গ্রামকে দুর্ভিক্ষের ঝড়ে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখেছে শীতল। লেখক শীতল মাঝির চোখ দিয়ে পাঠককে দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামগুলির সকরুণ চিত্র- 'শীতলের চোখের সামনে দিয়েই তো দুভির্ক্ষের এতবড়ো একটা ঝাপটা বয়ে গেল। এই নদী দিয়ে সে কত মরা মানুষ ভেসে যেতে দেখেছে, দেখেছে উজাড় হয়ে গেল গ্রামের পর গ্রাম। আড়িয়াল খাঁর অনিবার্য ভাঙনের মতো নিষ্ঠুর হাত নির্মমভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে গেছে সমস্ত। শ্রীহীন শূন্য প্রায় গ্রামগুলো যেন শ্মশানের মতো দাঁড়িয়ে।'[২১] আলোচ্য গল্পে গল্পকার দুর্ভিক্ষের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী চোরাবাজীদের প্রতিভূ মথুরা দাসেরও চিত্র অঙ্কন করেছেন দক্ষতার সাথে। গল্পের পরিশেষে দেখা যায় তারাপদ অত্যন্ত হতাশার বেদনায় সারারাত খেতে পারে না। অন্যদিকে মাঝিসুলভ আদর্শগত স্বভাবে সে চালের চোরাকারবারী মথুরা দাসকে পাহারাদারের হাত থেকে বাঁচায়,

কারণ সে তার নৌকার যাত্রী বলে মথুরা খুশি হয়, কিন্তু শীতল বিবেক যন্ত্রনায় বিদ্ধ হতে থাকে। কারণ সে জানে মথুরা মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে - 'এ অন্যায়, এ অত্যন্ত অন্যায়।'[২২]

পরিশেষে বলতে হয় ছোটোগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন সমাজসচেতন লেখক। বিশষ করে তাঁর প্রথম দিকের লেখা ছোটোগল্পগুলিতে এই সমাজ সচেতনতা বারে বারে ধরা পড়েছে। তিনি যখন বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন তখন যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বাংলাদেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকটের ভয়াবহতায় একদিকে সমাজের দরিদ্রশ্রেণীর মানুষগুলির চরম অসহায় অবস্থা, অন্যদিকে এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী মানুষের অবৈধ উপায়ে সম্পদ কুক্ষিগত করার লিপ্সা, চোরাকারবার, স্পেকুলেশান, খাদ্যে ভেজাল মেশানো, এমনকি গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে শহরের গনিকাপল্লীতে বিক্রী করে দেবার মতো দুঃখজনক ঘটনা বাংলাদেশের সমাজ জীবনে দুঃসহ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। এই বিশেষ পটভূমি থেকেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পের মালমশলা সংগ্রহ করেছেন। ফলে সেদিক থেক বিশ্লেষণ করলে তাঁর ছোটগল্পগুলোতে সামাজিক বাস্তবতার ভূমিকা অত্যন্ত প্রকট।

**তথ্যসূত্র -**


১। গঙ্গাপাধ্যায় নারায়ণ। গল্প সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ৭২৮।

২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৩২।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৩৩।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৬৫।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৮৯।

৬। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ। শ্রেষ্ঠ গল্প, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রকাশ ভবন, পৃষ্ঠা - ৩০।

৭। ড. রায় চৌধুরী বিনতা। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যলোক, পৃষ্ঠা - ৮০।

৮। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ। গল্প সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ৭৮১।

৯। বন্দোপাধ্যায় মানবেন্দ্র। গ্রন্থ - ভেদ- বিভেদ (১ ম খন্ড), পৃষ্ঠা - ২০৪।

১০। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ। গল্পসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ৫৯৯।

১১। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬০১।

১২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬০১।

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬০২।

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৫১।

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৫১।

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১১।

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮২১।

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮২৬।

১৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯০৮।

২০। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৩৭।

২১। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৩৫।

২২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৩৯।